সংহতি বাংলা কবিতা উৎসব ২০০৮

সংহতি সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে লণ্ডনের কুইন মেরি কলেজের একটি ভবনে গত ২৪শে অগাস্ট ২০০৮ তারিখে একটি বাংলা কবিতা উৎসবের আয়োজন করা হয়। সংহতির সাদর নিমন্ত্রণে এই সভায় যোগ দিতে পেরে খুশী হয়েছিলাম। ফারুক আহমেদ রনি ও অন্যান্য উদ্যোক্তাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, তাঁদের সহৃদয় ব্যবহার আমাকে স্পর্শ করেছে। সেদিন মাতৃভাষাপ্রেমিক বহুসংখ্যক মানুষের সমাগমে অনাবিল আনন্দস্রোতে ভ'রে উঠেছিলো মাইল এণ্ডের ঐ বিদ্যায়তনের প্রাঙ্গণ। বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন খ্যাতনামা কবি রফিক আজাদ, কবি বেলাল চৌধুরী, এবং আরও কয়েকজন। অসুস্থতাবশতঃ কবি দিলওয়ার আসতে পারেন নি, কিন্তু উদ্যোক্তারা সিলেটে গিয়ে তাঁর ভিডিও-সাক্ষাৎকার নিয়ে এসেছিলেন। সেই ছবি আমাদের মন কেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে জয় গোস্বামীকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিলো, ঐ সময়ে তাঁর অন্য প্রোগ্রাম থাকায় তিনি আসতে পারেন নি। কিন্তু লণ্ডনসহ বৃটেনের এবং ইয়োরোপীয় কন্টিনেন্টের নানা শহর থেকে মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন আমার পূর্বপরিচিত, কিছু নতুন মানুষের সঙ্গেও পরিচয় হলো। সকলের মধ্যে ঐক্যসূত্রটি ছিলো মাতৃভাষার প্রতি ও সেই ভাষায় লেখা কবিতার প্রতি অনুরাগ।

দেশান্তরিত বাংলাভাষীদের এক বিরাট দল এখন বৃটেনের বাসিন্দা। বাংলাদেশ আর পশ্চিমবাংলার কথা মনে রেখে সংহতি এই মানুষদের বলেছেন 'তৃতীয় বাংলা'। হয়তো বা বলা উচিত 'চতুর্থ বাংলা', কেননা আসাম ও ত্রিপুরাতেও বহুসংখ্যক বাংলাভাষী রয়েছেন, যাঁরা পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার আদলে নিজেদের নাম রেখেছেন 'ঈশান বাংলা'। আমরা সাধারণতঃ মনে রাখি না যে বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে যেমন প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানে মানুষ মাতৃভাষার জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তেমনি একষট্টি সালের উনিশে মে তারিখে শিলচরে এগারোজন বাংলাভাষী তাঁদের ভাষার স্বীকৃতির জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁদেরও ভাষাশহীদ বলতে হয়। উত্তর আমেরিকাতেও বাংলাভাষীদের একটি বিরাট গোষ্ঠী গ'ড়ে উঠেছে এবং তাঁদের ভাষাসাহিত্যভিত্তিক ক্রিয়াকলাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁরা হয়তো শীঘ্রই 'পঞ্চম বাংলা' হয়ে উঠবেন।

বৃটেনের বাংলাভাষীদের মধ্যে কতজন যে কবিতা লেখেন বা কবিতা ভালোবাসেন, তার একটা আন্দাজ পাওয়া গেলো ২৪শে অগাস্ট ২০০৮ তারিখের জমায়েতের মধ্য দিয়ে। বাংলা কবিতার চর্চা যে কতজনের প্রাণের কাছাকাছি, কত গভীরভাবেই তাঁদের আত্মপরিচয়ের অঙ্গ, সেই ব্যাপারটা বোঝা গেলো। এটা বিশেষ ক'রে প্রতীয়মান হয় সংহতি এই উপলক্ষ্যে যে-স্মারক গ্রন্থটি বার করেছেন সেটি দেখলে।

আমি নিজে দেশান্তরিত অবস্থায় প্রায় অর্ধশতাব্দী ধ'রে বাংলায় লিখে যাচ্ছি। একটু গর্ব ক'রেই দাবি করতে পারি যে এ ব্যাপারে আমি এখন সিনিয়রদের একজন ! এ দেশে প্রথম এসেছিলাম ১৯৬০ সালে, অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করতে। সেই পর্বেই আমার অক্সফোর্ড থেকে পাঠানো কবিতা কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতো। ঐভাবেই পাঠকদের কাছে আমার কবিপরিচিতি গ'ড়ে ওঠে এবং আমি 'ষাটের দশকের কবি' হিসেবে চিহ্নিত হই। সংহতি কবিতা উৎসবে বেলাল চৌধুরীকে দেখে দারুণ ভালো লেগেছিলো বিশেষতঃ এইজন্যে যে তিনিও 'ষাটের দশকের কবি' হিসেবে চিহ্নিত হতেন। সেই যুগে আমরা ভাবি নি যে লণ্ডনে এত বড় একটা বাংলা কবিতার আসর বসতে পারে। এখন আমরা দলে ভারী হয়েছি, ন্যায্যতঃ দাবি করতে পারি যে আমরা বাংলা ডায়াস্পোরার সাহিত্যিক, আমাদের সেই স্বীকৃতিটুকু দেওয়া হোক। বাংলাভাষার সাহিত্যিকদের মধ্যে ডায়াস্পোরার একটা বর্গ যে গ'ড়ে উঠতে পারে তা আগে যদিও ভাবা যায় নি, তবু এখন এটা ঘটনা। এখন আমরা আর নিছক প্রবাসী নই, আমরা এ দেশে শিকড় গেড়েছি।

এই বর্গীকরণ আমাদের উপর কিছু দায়িত্বও অর্পণ করে। শেষ বিচারে সাহিত্যকর্মের উৎস একজন ব্যক্তির সৃষ্টিশীলতা, যদিও নিকটস্থ অথবা দূরস্থিত কোনো-না-কোনো গোষ্ঠীর কিছু-না-কিছু সহযোগিতা ছাড়া ব্যক্তির প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। আর সাহিত্যের বিচার শেষ পর্যন্ত কেবল কতজন লিখছেন তার জরিপ দিয়ে হবে না, তার একটা বড় মাত্রা হবে গুণগত। সংখ্যার একটা মাত্রা নিশ্চয়ই থাকবে, তা একটা গোষ্ঠীর সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপের দিকে, তার পরিমাণের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে নির্দেশিত করে। রাজনীতি থেকে শিল্পসাহিত্য পর্যন্ত যে-কোনো খাতে কেউ যদি একটা নতুন আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে চান, তা হলে তাঁর কয়েকজন সহকর্মী লাগবে। সাহিত্যপত্রিকা চালানো বা কবিতা-উৎসবের আয়োজন করাও সেই জাতের ক্রিয়াকলাপের অন্তর্গত।

ক্রিয়াকলাপের প্রাচুর্য আনন্দদায়ক, তবু আমাদের নিয়ত লক্ষ্য রাখতে হবে সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিকে, এক-একজন শিল্পীর শৈল্পিক বিবর্তন এবং পরিণতির দিকে।

বিবর্তন আর পরিণতির শর্ত হলো মনকে খোলা রাখা, পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত থাকা, অপরের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য মানসিক প্রস্তুতি। আমাদের পুরোনো দেশকে আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাবো না, তা আমাদের রক্তের মধ্যে থাকবে, আমাদের ভাষার মাধ্যমেই তা আমাদের সত্তায় বহমান, কিন্তু আমরা যেন কেবলই পুরোনো দেশের জন্য নস্টালজিয়া নিয়ে না থাকি, যেন শুধু তাই দিয়েই আমাদের কবিতা না ভরাই। নতুন যে-জায়গায় আমরা শিকড় গেড়েছি, সেই অব্যবহিত পরিবেশ থেকেও আমাদের পুষ্টি এবং অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করতে শিখতে হবে। যিনি নিজেকে প্রকৃত অর্থে কবি ব'লে মনে করেন তাঁর কাছে কোনো দেশই শেষ বিচারে বিদেশ হতে পারে না। কবির চোখে ধরা পড়ে সর্বত্র বিরাজমান এই স্বষ্টির বিচিত্র গাছপালা, ফুলফল, পশুপক্ষী, সর্বত্র মাথার উপরে সেই একই সূর্যচন্দ্র, সেই একই আকাশের তারকাখচিত চাঁদোয়া, সর্বত্রই মানুষ-নামক প্রজাতির প্রেম আর বিদ্বেষ, পাপ আর পুণ্য। স্বনামধন্য ইংরেজ কবি কীট্‌স্‌ বলেছিলেন, কবি তিনিই, যিনি রাজার সমকক্ষ, দরিদ্রতম ভিক্ষুকেরও সমকক্ষ, যাঁর কানে বাঘের গর্জনও মাতৃভাষার মতো পরিষ্কার।

চিন্তাশীল মানুষের পক্ষে তার অব্যবহিত পরিবেশকে অগ্রাহ্য করা মূঢ়তা, কারণ ওভাবে মনের বৃদ্ধি হয় না। মানসিক বৃদ্ধি হয় বিশ্বের সাথে যোগে এবং আদানপ্রদানে। আমি খুব গভীরভাবেই অনুভব করি যে সমস্ত পৃথিবীই আমার স্বদেশ, সমগ্র মানবজাতিই আমার স্বজাতীয়। অন্যদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় থাকে। আমি মনে করি যে অখণ্ড পৃথিবীর প্রতি এই মমত্ববোধকে, সমগ্র মানবজাতি সম্পর্কে এক দরদী স্বাজাত্যবোধকে আমাদের লেখায় সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। আমরা যারা ডায়াস্পোরার অবস্থান থেকে বাংলায় লিখছি, তাদের সামনে একটা উল্লেখযোগ্য সুযোগ আছে বাংলাভাষার খাতে আমাদের বিচিত্র এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার স্রোতকে বইয়ে দেওয়ার। সেটা করতে পারা আমাদের একটা বিশেষাধিকার। আমরা যেন সেই প্রিভিলেজের যোগ্য হয়ে উঠতে পারি। ঐ অধিকারকে খাটাতে পারলে আমাদের মাতৃভাষার বাদ্যযন্ত্রে নব নব তার সংযোজিত হবে।

সেদিন সংহতি কবিতা উৎসবের ভাবনার ফোকস ছিলো 'শান্তির জন্য কবিতা', এবং তাকে মূর্ত করবার জন্য উৎসব আরম্ভ হয় কতগুলি সাদা পায়রাকে খাঁচা থেকে মুক্তি দিয়ে। কোনো সন্দেহ নেই, বিশ্বে শান্তি আনয়ন এই শতকে আমাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলির অন্যতম। বিগত শতকে মানুষে মানুষে হানাহানির চূড়ান্ত হয়েছে, কিন্তু শান্তির বাণীও শোনাতে চেয়েছিলেন কেউ কেউ। আজকের দিনে সেই প্রজ্ঞাদীপিত বাণীগুলিকেই আমাদের চিনে নিতে হবে বরেণ্য উত্তরাধিকার হিসেবে। আমাদের ভাবতে হবে কিভাবে মানুষে মানুষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটা টেঁকসই ব্যবস্থাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়।

মানুষের প্রতি মানুষের বিরামহীন হিংস্রতা একটা বিষয়, যা আমাকে গত কয়েক বছর ধ'রে ক্রমাগত ভাবাচ্ছে। আমার তৃতীয় নাটক 'সুপর্ণরেখা'য় স্রেব্রেনিৎসায় বসনিয়ার মুসলমানদের গণহত্যার কথা আছে, তৃতীয় উপন্যাস 'জল ফুঁড়ে আগুন'-এ আছে গুজরাটের দাঙ্গার একটা পশ্চাদ্ভূমি। বস্তুতঃ 'জল ফুঁড়ে আগুন' শিরোনামটি আমি ব্যবহার করেছি একটি রূপক হিসেবে। সমুদ্রনিম্ন আগ্নেয়গিরি থেকে যেমন অনবরত জ্বলন্ত লাভা বেরোয়, অথচ সমুদ্রের বিপুল জলরাশি তাকে নেভাতে পারে না, তেমনি সভ্যতার তলদেশ থেকে ক্রমাগত নিঃসৃত হয় বর্বরতা, বিদগ্ধতম সভ্যতাও যাকে দমন করতে পারে না। আমার যে-বইটি এখন প্রেসে গেছে সেখানে ২০০৬-এর ইজ়রায়েল-লেবাননের সংঘর্ষ বিষয়ে আমার প্রধান চরিত্রের চিন্তাস্রোত কয়েকটি অধ্যায়ের পশ্চাদ্ভূমি হিসেবে কাজ করেছে।

বিশ্বে শান্তি আনতে হলে শান্তির ছায়াসহচর অশান্তির সঙ্গে কিভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে তার কৌশলগুলি আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। পৃথিবী সত্যিই এখন আগেকার চাইতে অনেক বেশী ছোট হয়ে গেছে। নিকট-দূরের পরিপ্রেক্ষিতই বদলে গেছে। যারা দূরের মানুষ ছিলো তারা এখন নিকট প্রতিবেশী হয়েছে। সেই ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, জাতিতে জাতিতে বিরোধিতা আর রক্তক্ষয়কারী দ্বন্দ্ব এখন সংক্রামক ভাইরাসের মতো দ্রুতগতিতে বংশবিস্তার করছে। প্রাণলালনকারিণী প্রকৃতির অস্তিত্ব বিপন্ন। এই বিপদকে রুখতে হলে, আমাদের উত্তরসূরিদের হাতে বাসযোগ্য পৃথিবী দিয়ে যেতে হলে আমাদের স্বার্থঘটিত কলহগুলির নিষ্পত্তি করতে জানতে হবে। নিছক অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের সূত্র দিয়ে

সেই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, কেননা সেই পথ মূলতঃ কতগুলি ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর স্বার্থ দ্বারা চালিত। অন্যদের ক্ষতির কথা মন থেকে কেটে বাদ দিয়ে কেবল উন্মত্তভাবে স্বার্থের অন্বেষণ এবং সংরক্ষণ, একই গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতার স্তূপীকরণ—এটাই তো অনর্থের মূল। সেই শিকড় উপড়ে ফেলতে হলে পরকে আপন করার শিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে, বুঝতে হবে যে বিবাদের পথে নয়, ক্রমাগত সংলাপ চালানোর পথেই প্রগতি সম্ভব, এর বিকল্প নেই। এই কাজে কবিরা একটা শ্রদ্ধেয় ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাঁরা তরুণ প্রজন্মদের মধ্যে প্রকৃতি এবং বিশ্ববাসী মানুষ সম্পর্কে আত্মীয়তার বোধকে জাগিয়ে তুলতে পারেন।

সব সমাজেই কবিতার দরকার, যাতে জীবনের সত্যগুলিকে আমরা পূর্ণতঃ প্রত্যক্ষ করতে পারি, স্বীকার করতে পারি, উচ্চারণ করতে পারি। কবিতা সেই আয়না, যাতে আমরা সেই সত্যগুলোর চেহারা দেখতে পাই—অর্থাৎ যদি কবিদের সাহস আর আত্মসম্মান থাকে, যদি তাঁরা নির্লোভ থাকতে পারেন, সত্য কথা বলবার সাহস খুইয়ে না বসেন। আজকের ছোট-হয়ে-যাওয়া পৃথিবীতে সত্যবাদী এবং মানবদরদী কবিদের প্রয়োজন আছে। আমার বিশ্বাস, বাংলা ডায়াস্পোরার কবিদেরও কিছু দেবার আছে।

আশা করি এরকম উৎসব ভবিষ্যতে আরও হবে, আর সেইসব জমায়েতে প্রতিনিধিরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার আরও সুযোগ পাবেন।

কেতকী কুশারী ডাইসন